মুফতী শফী রহ.
উম্মাহর প্রতি
ঐক্যের
আহ্বান
অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

উম্মাহর প্রতি ঐক্যের আহ্বান

মুফতী শফী রহ.

উম্মাহর প্রতি ঐক্যের আহ্বান

মূল

মুফতী শফী রহ.

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

প্রকাশনায়

তাযকিয়াহ সেন্টার

ঢাকা, বাংলাদেশ

উম্মাহর প্রতি ঐক্যের আহ্বান

মূল : মুফতী শফী রহ.
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল মাসউদ

প্রকাশক : মো. মামুনুর রশীদ
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৬৭০৮৩০৯৬০
প্রকাশনা : তাযকিয়াহ সেন্টার
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৬ খ্রি.

বানান ও ভাষারীতি : উমেদ
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস
৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায় : রাহনুমা প্রকাশনী
৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ইহদা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের দীর্ঘ নেক হায়াত ও সুস্বাস্থ্য কামনায়।

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বক্ষ্যমাণ বইটির কথা প্রথম জানতে পারি মুহতারাম উস্তাদ শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেবের অনবদ্য গ্রন্থ *উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা* পড়ে। সেখানে শায়েখ এই বইটি পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখনই আমি পুরো বইটি অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নিই এবং খুব বড় না হওয়ায় একদিন সন্ধ্যার পর বইটি হাতে নিয়ে এক বসাতেই শেষ করি। পাকিস্তানের মুফতী শফী রহ.-এর *জাওয়াহিরুল ফিকহ* এর প্রথম খণ্ডের সাথে 'ওয়াহদাতে উম্মত' নামে এটি ছাপা হয়েছে। পড়ার পর বইটি আমার অসম্ভব রকমের ভালো লেগেছিল।

দ্বীনের আমানতদার উলামায়ে কেরামের অনেকে বর্তমানে শাখাগত বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-কলহে জড়িয়ে মূল্যবান সময় ও শ্রম নষ্ট করে চলেছেন। অপরদিকে খৃস্টান মিশনারি, কাদিয়ানী, নাস্তিক্যবাদী, সেক্যুলার, কম্যুনিস্ট বা সমাজতন্ত্রবাদী, প্রকৃতিবাদী, সংশয়বাদী, ধর্মদ্রোহী, মাজারী, বেদআতীরা সাধারণ মুসলিমদের ঈমান হরণ করে চলেছে। অথচ সেদিকে আমাদের মনোযোগ যেভাবে আবদ্ধ হওয়ার দরকার ছিল তা হচ্ছে না। কারণ, ইখতিলাফি বিষয়ে সময়-শ্রম দেওয়ার পর অন্য দিকগুলো নিয়ে ভাবার ফুরসতই আমাদের হয় না। এটা তো বাস্তব যে, যারা ফিকহ নিয়ে অহেতুক মন্তব্যবাজি করে মানুষের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয় তাদের জবাব প্রদানে কিছু লোককে কাজ করতে হবে। তবে আমাদের প্রধান ও পুরো শক্তি সেখানে ব্যয় করাটা কখনোই সমীচীন নয়। আমাদের উচিত ছিল শিরিক-কুফুর-বেদআতের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে যাওয়া। কিন্তু তা না করে আমরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত শক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছি। এসব সমস্যা নিরসনকল্পে বা কমিয়ে আনার পক্ষে বইটি দারুণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মনে করে তখনই বইটি অনুবাদের ইচ্ছা পোষণ করি। এই বিষয়ে সুহৃদ মুহাম্মাদ হোসাইন ভাইয়ের মতামত জানতে চাইলে তিনি

মুহতারাম উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেবের কাছ থেকে বিষয়টি জেনে নেওয়ার কথা বলেন। তারপর একদিন তিনি আমাকে নিয়ে হাজির হন কেরাণীগঞ্জে অবস্থিত শায়েখের মাদরাসায়। সেখানে শায়েখের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় এবং এক ফাঁকে হোসাইন ভাই বইটি অনুবাদ করার বিষয়ে শায়েখের মতামত জানতে চাইলে তিনি ইতিবাচক উত্তর দেন। তারপর আমার ইচ্ছাটা আরও পাকাপোক্ত হয়। এরপর সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সময়-সুযোগের অভাবে কাজটা হয়ে উঠছিল না। দাওরায়ে হাদীসে পড়াকালীন প্রথম সাময়িক পরীক্ষার বন্ধে তাই বাড়ি না গিয়ে ব্যক্তিগত কিছু পড়াশোনার পাশাপাশি বইটা অনুবাদ করে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই এবং আল্লাহর দয়ায় সেটা যথাসময়ে সমাপ্তও হয়।

বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে বইটি দ্রুত প্রকাশিত হয়ে প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে যাওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার একার পক্ষে সেই খেদমত আঞ্জাম দেওয়াটা ছিল কষ্টকর। সুহৃদ বড়ভাই তাযকিয়া সেন্টারের পরিচালক জনাব মো. মামুনুর রশীদ সাহেব এগিয়ে না এলে হয়তো বইটা এত দ্রুত আলোর মুখ দেখত না। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং আরও যারা নানাভাবে আমাকে পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

বইটিকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের জন্যে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। তারপরেও মানুষ যেহেতু ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয় তাই আমাদের অলক্ষ্যে কিছু ভুল থেকে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তেমন কিছু গোচরীভূত হলে আমাদের অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব। আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন। আমীন!

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
২৯-১০-২০১৬ খ্রি.

সূচিপত্র

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

প্রিয় বন্ধুগণ, লৌকিকতাহীন একটা বাস্তব সত্য হলো, জীবনের শুরু থেকেই আমি কোনো বক্তা ছিলাম না। তেমন ভালো কোনো ওয়ায়েজও ছিলাম না। এমনকি বড় কোনো মজলিসে কথা বলতেও অভ্যস্ত নই। আমার পুরো জীবনটাই পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে কেটেছে। তারপর কিছু সাদা কাগজ কালো করারও সুযোগ হয়েছে। সাধারণ মুসলিমদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের ধারা অব্যাহত ছিল। আমার মুরুব্বিরা তাঁদের সুধারণাবশত ফতোয়া প্রদানের খেদমতও আমার কাঁধে অর্পণ করেছেন। জীবনের একটা বড় অংশ এভাবেই ব্যয় হয়েছে।

মুহতারাম হাকিম আব্দুর রহিম আশরাফ সাহেব সুধারণাবশত আমাকে এখানে বসিয়েছেন। তিনি আমাকে যে বিষয়ে আলোচনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন সেটি এতই সুস্পষ্ট ও সর্বজনবোধ্য যে, এখানে দ্বিমত হওয়ার কোনো সুযোগই নাই।

এমনিভাবে আমাদের অঙ্গনে বিষয়টি অস্বীকার করার প্রবণতাও এতটাই ক্ষীণ যে, এই বিষয়ে মুখ খোলারও সাহস হয় না। আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হলো উম্মতে ইসলামিয়া হচ্ছে দলাদলিমুক্ত ঐক্যের প্রতীক। আপন স্থানে কথাটা ঠিক আছে। একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ দুনিয়াবাসীকে এর উল্টা চিত্র প্রদর্শন করে তাদের জানাচ্ছে যে, এই উম্মত হলো ঐক্যের অযোগ্য বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ একটা জাতি। এরা নিজেদের অবস্থা এবং সময়ের প্রয়োজন থেকে দৃষ্টি হটিয়ে শুধু মাসআলা-মাসায়েলের দলিল নিয়ে আলোচনায় ডুবে থাকে। মূলত এটা হচ্ছে আমাদের চরম বোকামি। এর দ্বারা আমাদের বাস্তবজীবনের কোনো প্রয়োজনই পূরণ হচ্ছে না। সেজন্য আমাকে এই বিষয়ের পক্ষে বলার চেয়ে বেশি বিপক্ষে বলতে হবে

এবং দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা এবং এর ভেতরগত কারণ উদঘাটন এবং এর সমাধান নিয়ে সুচিন্তিত মতামত পেশ করতে হবে।

ইসলামের মূল শিক্ষা হলো, কেবল দুনিয়ার সকল মুসলিমকেই নয়, বরং পুরো মানবজাতিকে এক কওম, এক বংশ এবং এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা। বিষয়টি কারও কাছে অজানা নয়। পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট শব্দ : خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

অর্থাৎ 'তোমাদের তিনি এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন' এর মধ্যে ব্যাপকভাবে সমগ্র মানবজাতিকে আর إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ অর্থাৎ 'নিশ্চয় মুমিনরা ভাই ভাই' এর মধ্যে সমস্ত মুসলিমকে একক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে, যেটা তখনকার মুসলিমদের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের মৌলবাণী ও দিক-নির্দেশনামূলক নসিহত প্রদান করেছিলেন। সেখানে তিনি এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামের মধ্যে সাদা-কালো, আরবী-অনারবী ইত্যাদির কোনো আলাদা গুরুত্ব নেই। বরং সবাই এক মা-বাবার সন্তান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দীপ্ত ঘোষণা জাহিলী ঐক্যকে, যা দেশ-বংশ-ভাষা ও শরীরের রঙের উপর ভিত্তি করে লোকেরা গড়ে তুলেছিল, ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তৎস্থলে দ্বীনী ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটাই মূলত প্রকৃত ঐক্য, যা পূর্ব-পশ্চিমের সমগ্র মানবজাতিকে ও নানা রঙ-বর্ণের মানুষদের এক কাতারে এনে ভ্রাতৃত্বের সুতোয় গাঁথতে পারে। দেশ-রঙ বা ভাষার উপর ভিত্তি করে জাহেলী যুগের লোকেরা যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল সে যামানায়, বর্তমান সময়ের সভ্যতার দাবিদার লোকেরা পুনরায় তার পুজো করে চলেছে। এই জাহেলী ঐক্যের ভিত্তিতেই মানবস্তরে পার্থক্য রচিত হচ্ছে। আর পার্থক্যটাও এমন যে, হাজারো চেষ্টা-শ্রমের দ্বারা সেটা মেটানো সম্ভব নয়। যে রঙের দিক দিয়ে কালো সে কখনোই সাদা হতে পারে না। যে বংশীয় পরিচয়ে সাইয়্যেদ বা শেখ নয় সে যত চেষ্টাই করুক সাইয়্যেদ বা শেখ হতে পারবে না। ইসলাম এমন এক ঐক্যের পথে মানুষদের দাওয়াত দেয় যেখানে সকল শ্রেণির মানুষ

কোনোরূপ কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই অংশ নিতে পারে। আর এই ঐক্য যেহেতু একজন প্রকৃত মালিক, যিনি অংশীদারমুক্ত একক সত্তা, তাঁর সাথে সম্পর্কিত ও তাঁর আনুগত্যের সাথে জড়িত তাই এটা বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাকে সব সময়ই সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলে। এই মজলিসে আমার আলোচ্য বিষয়ের ইতিবাচক দিকের জন্য এই সামান্য ক'টি কথাই যথেষ্ট হবে আশা করি। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই বিষয়টি একটি বিশ্বাস ও দর্শনের আকারে মানুষের মুখে আর কিতাবের কাগজে লিখিত অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু যদি নিজেদের পাশাপাশি পুরো বিশ্বের মানুষকে বাস্তব অবস্থার উপর নজর বুলানো হয় তাহলে এর বিপরীত চিত্র প্রতিভাত হবে। মনে হবে, এই জাতি হলো বিচ্ছিন্নতার প্রতিচ্ছবি। যার মাঝে ঐক্যের ও মিলেমিশে থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়।

এই জাতি সমস্ত মানুষকে এক আল্লাহর আনুগত্যের ছায়ায় একত্রিত করে ভ্রাতৃত্বের দাওয়াত দেয় এই বলে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

অর্থাৎ, 'হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'[১]

ধারাবাহিক দাওয়াত এবং বুঝানোর পরেও যারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থেকে দূরে সরে থাকে তাদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে এক জাতি, এক গোষ্ঠী এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে মজবুত প্রাচীরে পরিণত করেছিল যে জাতি, আজ তারা নিজেরাই নানারকম বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত, পারস্পরিক দলাদলিতে মত্ত এবং একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলগত বিরোধ, পেশা ও কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য, ধনী-গরীবের ভেদাভেদ আগে থেকেই পারস্পরিক দূরত্বের ভিত্তিরূপে ছিল। কিন্তু আফসোসের কথা

---

১ সূরা নিসা (০৪) : ০১

হচ্ছে, যে দ্বীন ও আল্লাহর ইবাদত অন্যদের আপন বানানোর এবং বংশ, দেশ ও ভাষার পার্থক্য মুছে দেওয়ার মূলমন্ত্র ছিল সেই দ্বীনই আজ আমাদের বিবাদ-বিসম্বাদ এবং শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি পুরো মুসলিম মিল্লাতকে দ্বীনী ও দুনিয়াবী সব দিক দিয়েই ক্ষতির সম্মুখীন করেছে এবং ধ্বংসের গহ্বরমুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার সহসা কোনো উপায়ও চোখে পড়ছে না।

আজ আমাদের প্রতিটি সংগঠন দলাদলি আর প্রতিটি মিলনমেলা বিচ্ছিন্নতার কেন্দ্রবিন্দুর আকার ধারণ করেছে। এটাই সেই রোগ যা মুসলিম জাতিকে এত বিশাল সংখ্যাধিক্যতা সত্ত্বেও দুর্বল ও অপদস্থ করে রেখেছে। প্রত্যেকটা জাতি আমাদের নিজেদের দলভুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে আছে। মুসলিমদের প্রতিটি ক্ষেত্রে, আকায়েদ থেকে নিয়ে আমল-আখলাক পর্যন্ত, সংস্কৃতি-জীবনাচার থেকে নিয়ে লেনদেন ও অর্থনৈতিক বিষয় সবকিছুই আজ অন্যান্য জাতির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে।

একদিকে রাষ্ট্র, ক্ষমতা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে ধর্মদ্রোহিতা ও সংশয়-সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা-দর্শনকে নড়বড়ে করে দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহর আনুগত্যের মূলনীতিগুলোকে নব্য শিক্ষা ও সংস্কারের মোড়কে পেঁচিয়ে এবং কল্যাণকামিতা ও সমব্যথিতার মুখোশ পরিয়ে মূলত প্রবৃত্তির পূজারিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে ইংরেজ আমলে ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম এবং দ্বীনের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের শিক্ষা ও চিন্তা-গবেষণাকে দূরে ঠেলে দিয়ে অন্যদের থেকে পাওয়া বিষয়গুলোকেই সৌভাগ্য লাভের মাধ্যম মনে করছে। কারণ, তাদের শিক্ষা-দর্শন ও সভ্যতার ছায়ায় লাগামহীন আত্মপূজা ও স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের অবারিত সুযোগ রয়েছে। আর আমাদের উলামায়ে কেরাম শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য এবং মাসআলা-মাসায়েলের অপ্রয়োজনীয় আলোচনা নিয়ে এতটাই মগ্ন হয়ে আছেন যে, ইসলামের উপর আসা নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে তারা আজ বেখবর।

সমস্যার কারণ ও প্রতিকার

আজকের এই মজলিসে উম্মতের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করেন এমন আলেম-উলামা ও চিন্তাবিদদের উপস্থিতি লক্ষ করছি। মন চাচ্ছে উম্মাহর এই সমস্যার কারণ এবং এর প্রতিকার নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করি।

সর্বপ্রথম আমি এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাই, ইখতিলাফি মাসআলায় মতামতের পার্থক্য ক্ষতিকর নয়। একে মিটিয়ে ফেলারও প্রয়োজন নেই। আর এটি কখনো সম্ভবও নয়। মতের অমিল হওয়া ইসলামী ঐক্যের পথে বাধাও নয়। এটি একটি স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত বিষয়। ইসলামী কোনো দলই এর থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। পারাটা সম্ভবপরও নয়। কোনো দলের মধ্যে প্রত্যেকটা কাজে ও কথায় পরিপূর্ণভাবে মতের মিল শুধু দুই অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। এক হলো, যেখানে চিন্তা-ভাবনা করার মতো বুঝমান এমন কেউ নেই যিনি উক্ত কার্যক্রমের উপর চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব কোনো মতামত দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই কারণে কোনো ব্যক্তি কিছু একটা বলে দিলে অন্যরা সবাই তার সাথে এই কারণে একাত্মতা পোষণ করে যে, তাদের নিজস্ব কোনো ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিই নাই। দ্বিতীয় হলো, যেখানে লোকেরা আত্মবিক্রিত ও খেয়ানতকারী। তারা কোনো একটি বিষয়কে ভুল ও ক্ষতিকর জানা সত্ত্বেও শুধু অন্যের স্বার্থে মতের অমিল প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। যার মধ্যে বুদ্ধি-বিবেক ও দ্বীনদারী রয়েছে তার পক্ষে মতানৈক্য এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল, ইখতিলাফ বা মতানৈক্য বুদ্ধি-বিবেক ও দ্বীনদারী থেকেই সৃষ্টি হয়।

এই জন্য আপন অবস্থান থেকে একে নিন্দনীয় বলার কোনো সুযোগ নাই। আর যদি বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যাবে, মতানৈক্য যদি আপন গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে তবে সেটা কখনোই কোনো দল বা গোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর হয় না। বরং এতে অনেক ইতিবাচক ফায়দা পাওয়া যায়। ইসলামে পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার কারণ এটাই যে, এতে করে একটা বিষয়ের বিভিন্ন দিক এবং নানারকম মতামত জানা সম্ভব হয়। যার মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। যদি মতানৈক্যকে নিন্দনীয় মনে করা হয়, তাহলে মাশওয়ারা বা পরামর্শ করার কোনো যৌক্তিকতা আর থাকে না।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে মতানৈক্য

ব্যবস্থাপনা ও অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয়ে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতেই তাঁর দরবারে মতানৈক্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীদের যামানায় ব্যবস্থাপনাগত বিষয় ছাড়াও অনেক সময় নিত্যনতুন সমস্যাবলি এবং এমন শরঈ মাসায়েলের উদ্ভব হতো, কুরআন-হাদীসে যার সুস্পষ্ট কোনো সমাধান পাওয়া যেত না। অথবা কুরআনের এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের অথবা একটা হাদীসের সাথে আরেকটা হাদীসের বাহ্যিক বিরোধ পরিলক্ষিত হতো। কুরআন-সুন্নাহর নুসূসের মধ্যে গভীর চিন্তা-গবেষণা করে সেই বাহ্যবিরোধকে দূর করতে এবং শরঈ মাসায়েলের উদ্ভাবনকল্পে নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও কেয়াসের আশ্রয় নিতে হতো। স্বাভাবিকভাবেই তখন মতের পার্থক্য সৃষ্টি হতো। এমনটি ঘটা সুস্থ বিবেক ও দ্বীনদারী কোনোটিরই পরিপন্থী নয়।

সালাতের মতো বহুল প্রচলিত বিষয়, যা দৈনিক পাঁচবার আদায় করা হয়, তারও শাখাগত কিছু বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে। এমনিভাবে কুরআন-হাদীসে অনুল্লেখিত বা অস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয বিষয়ক মাসআলার মধ্যেও সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতের অনৈক্য হওয়ার কথা সবারই জানা আছে। তারপর তাঁদের ছাত্রবৃন্দ তাবেয়ীগণের কর্মধারাও আমরা জানি। তাঁদের মধ্যে একটা জামাত কোনো এক সাহাবীর মতকে অবলম্বন করেছেন আবার অন্য কেউ আরেকজন বিপরীত সাহাবীর মতকে গ্রহণ করে সেটার উপর আমল করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীদের এই পুরো কল্যাণময় যুগে এবং তাঁদের পরে মুজতাহিদ ইমামদের ও তাঁদের অনুসরণকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝে এমন একটা ঘটনারও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাঁরা একে অপরকে গোমরাহ বা ফাসেক বলেছেন। অথবা এক মতের পক্ষাবলম্বনকারীরা অন্য মতের লোকের পেছনে নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অথবা মসজিদে যাতায়াতকারী কাউকে এ কথা জিজ্ঞেস করেছেন যে, এখানকার ইমাম ও মুসুল্লীরা আযান ও ইক্বামাতের শব্দাবলির মধ্যে এবং সূরা ফাতেহা পাঠ, রফয়ে ইয়াদাইন ইত্যাদির মধ্যে

কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এসব মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা নিয়ে পারস্পরিক গালি-গালাজ, হাসি-ঠাট্টা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সেই কল্যাণময় যামানায় কল্পনাও করা যেত না ।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার্র মালেকী কুরতবী রহ. তার স্বীয় গ্রন্থ *জামিউ বয়ানিল ইলমী ওয়া ফাদলিহী* এর মধ্যে সালাফে সালেহীনের পারস্পরিক মতানৈক্যের অবস্থা নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন,

عن يحي بن سعيد قال:و لا يرى ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا و يحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله و لا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه

অর্থাৎ, ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ রহ. বলেন, মুফতিয়ানে কেরাম সব সময় ফতোয়া প্রদান করতে থাকতেন। কুরআন-হাদীসে অনুল্লেখিত বিষয়ে একজন হয়তো হালালের ফতোয়া দিয়েছেন তো অন্যজন হারামের। কিন্তু হারাম ফতোয়া প্রদানকারী মনে করতেন না যে হালালের ফতোয়া যিনি দিয়েছেন তিনি এর কারণে ধ্বংস বা গোমরাহ হয়ে গেছেন। এমনিভাবে হালাল ফতোয়া প্রদানকারীও মনে করতেন না যে হারাম ফতোয়া প্রদানকারী গোমরাহ হয়ে গেছেন।[২]

এই কিতাবেরই আরেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে,

عن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم أسوة حسنة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم أسوة حسنة

অর্থাৎ, উসামা ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রহ.কে আস্তে কেরাআত বিশিষ্ট সালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা

২ *জামিউ বয়ানিল ইলম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০২

পড়া বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি উত্তরে বললেন, যদি তুমি তা পড়ো তবে সে বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যদি না পড়ো তবে সে বিষয়েও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।[৩] অর্থাৎ, এই দুই মতের মধ্যে আপনি যার উপর আমল করবেন সেটাই যথেষ্ট হবে। কারণ উভয় দিকে সাহাবায়ে কেরামের একটা জামাতের মতামত রয়েছে।

একটি সন্দেহের অপনোদন

দ্বীনের মূলনীতি এবং মতানৈক্যের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের এই সংশয় হতে পারে যে, ইসলামী শরীয়তের একই জিনিস হালালও হবে আবার হারামও হবে, জায়েযও হবে আবার নাজায়েযও হবে এটা কী করে সম্ভব? এটা তো সুস্পষ্ট যে, এই দুইয়ের মধ্যে হতে একটা সঠিক আরেকটা ভুল। সুতরাং উভয় মতের প্রতি একসাথে শ্রদ্ধাপোষণ করা সম্ভব নয়। কারণ সে একটাকে ভুল মনে করছে। আর ভুলকে ভুল বলাটাই প্রকৃত দ্বীনদারী।

এই সংশয়ের উত্তর হলো, আমাদের আলোচনা সাধারণ হালাল-হারাম এবং জায়েয-নাজায়েয নিয়ে নয়। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট নসসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু জিনিস তো নিঃসন্দেহে হারাম। যেমন : সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া ইত্যাদি। এখানে দ্বিমত হবার কোনো সুযোগ নাই। সালাফে সালেহীনের মাঝেও এই বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াটা ছিল অসম্ভব। এইসব বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া তো প্রকারান্তে দ্বীনের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণাদিকে অস্বীকার করার নামান্তর। উম্মাহর ঐকমত্যে এটা ভ্রষ্টতা এবং ধর্মদ্রোহিতার কাতারে পড়ে। যদি কেউ এমন করে থাকে তবে তার থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করা ঈমানের দাবিও বটে। এখানে শিথিলতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নাই।

---

৩ *জামিউ বয়ানিল ইলম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০২

মতানৈক্য সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের সাথে উদারতা ও কোমলতা প্রদর্শনের নীতি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না। অথবা পাওয়া গেলেও সেটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট হবার দরুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তার উপর আমল করা সম্ভব হয় না। অথবা দুই আয়াত বা হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক কিছু বিরোধ পরিলক্ষিত হওয়ার ফলে মুজতাহিদ আলেমকে কুরআন-সুন্নাহর নুসূসের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিন্তা-গবেষণা করে সেই বিধানের মূল উদ্দেশ্য উদঘাটন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন করতে হয়। এই অবস্থায় হতে পারে একজন মুজতাহিদ আলেম তার গবেষণার নীতিমালার আলোকে কুরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা ইত্যাদিতে চিন্তা-গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, এই কাজটা জায়েয। অন্যদিকে অপর মুজতাহিদ আলেমও একই বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে সেটা নাজায়েয হওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরা দু'জনই আল্লাহ তাআলার দরবারে সওয়াবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। কাউকেই ভর্ৎসনা করা হবে না। যাঁর সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার কাছে সঠিক সাব্যস্ত হবে পরকালে তিনি পাবেন দুই নেকী। আর যাঁরটা সঠিক নয় তিনি পাবেন এক নেকী। এই কারণে অনেক আলেম মনে করেন, মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী উভয় মতই সহীহ এবং হক। তার কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী। ইবাদাত-বন্দেগী ও হুকুম-আহকামে তার বিশেষ কোনো উপকার নাই। তিনি শুধু বান্দাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চান। তো যখন প্রত্যেকেই নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাশক্তি শর্ত মোতাবেক যথাস্থানে ব্যয় করেছেন তখন উভয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেন। উভয়ের সিদ্ধান্তই সহীহ হবে। তবে উম্মতের অধিকাংশ ও মুজতাহিদ ইমামদের সিদ্ধান্ত হলো, আল্লাহ তাআলার ইলমে এঁদের দু'জনের যেকোনো একজনই সঠিক বলে বিবেচিত হবেন। যিনি স্বীয় ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি সর্বদিক দিয়ে সফলকাম এবং দুই সওয়াবের অধিকারী। আর যিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেও সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি তিনি অপরাগ বলে বিবেচিত হবেন। তাঁকে কোনো নিন্দা বা ভর্ৎসনা করা হবে না। বরং পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তাঁকেও এক নেকী প্রদান করা হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও শিক্ষা

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আপনাদের শুনাতে চাচ্ছি। এটি শিক্ষণীয়ও বটে। তা হলো, কাদিয়ানে প্রতি বছরই আমাদের জলসা হতো। আমার উস্তাদ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.ও সেখানে অংশগ্রহণ করতেন। এক বছর তিনি সেই জলসায় উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। একদিন সকালে ফজরের সালাতের সময় অন্ধকারে তাঁর কাছে এসে দেখি, তিনি মাথা ধরে খুব চিন্তিত অবস্থায় বসে আছেন।

আমি বললাম, 'হযরতের অবস্থা কেমন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ভালোই। তবে অবস্থার কথা কী বলছ? আমার জীবনই তো বরবাদ হয়ে গেল!' আমি বললাম, 'হযরত! আপনার সারাটা জীবনই তো ইলমের খেদমতে আর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজেই কেটেছে। হাজার হাজার আলেম-উলামা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যারা আপনার ছাত্র। আপনার থেকে শিক্ষা অর্জন করেছে, উপকৃত হয়েছে। বর্তমানে তারা দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছে। আপনার জীবন যদি বরবাদ হয় তবে কার জীবন আর সফল হবে?'

হযরত বললেন, 'সত্যিই পুরো জীবনকে আমি নষ্ট করে দিয়েছি।'

আমি বললাম, 'হযরত বিষয়টা কী?'

তিনি বললেন, 'আমাদের জীবন, আমাদের তাকরীর, আমাদের সব চেষ্টা-পরিশ্রমের শেষ কথা হলো, ভিন্ন মাযহাবের উপর হানাফীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাসআলার দলিল তালাশ করা। অন্যান্য ইমামদের উপর তার মাসআলাকে প্রাধান্য দেওয়া। এটাই হলো আমাদের পরিশ্রম, পাঠদান এবং ইলমী জীবনের সম্বল। এখন চিন্তা করে দেখছি, কোন জিনিসের জন্য জীবনটাকে ব্যয় করলাম? আবু হানিফা রহ. তো আমাদের প্রাধান্য প্রদানের প্রতি মুখাপেক্ষী নন যে, আমরা এর মাধ্যমে তাঁর উপর অনুগ্রহ করব। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন সেই মর্যাদাই মানুষের কাছে তাঁকে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় করার জন্য যথেষ্ট।

আর ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ সহ অন্যান্য ফকীহদের বিপক্ষে আমরা নিজেদের প্রাধান্য প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে আছি। অথচ এতসব কিছু করার পর সর্বোচ্চ এই কথা বলা যেতে পারে, আমাদের মাযহাব সঠিক, তবে ভুল হবার আশঙ্কাও আছে। আর অন্যদের মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হবার সম্ভাবনাও আছে। এ সকল দ্বীনি আলোচনা, সূক্ষ্ম গবেষণা ও বিশ্লেষণের এর চেয়ে বেশি আর কোনো ফায়দা নেই।

তারপর তিনি বললেন, 'আরে মিয়া! হাশরের মাঠেও তো এই রহস্য উন্মোচিত হবে না যে কোন মাযহাব সঠিক ছিল আর কোন মাযহাব ভুল। ইজতিহাদি মাসআলার ব্যাপারটা এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে, দুনিয়াতে এর সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে না। দুনিয়াতেও আমরা সর্বোচ্চ বিচার-বিশ্লেষণ করার পর এতটুকু বলার ক্ষমতা অর্জন করি, এটাও সঠিক এবং ওটাও সঠিক। কিংবা বলতে পারি, এটি সঠিক তবে ভুল হওয়ারও আশঙ্কা আছে। আর ওটি ভুল তবে সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ তো গেল দুনিয়ার কথা। কবরের মধ্যেও মুনকার-নাকীর জিজ্ঞেস করবে না, রফয়ে ইয়াদান করা সঠিক ছিল নাকি না-করা? আমীন জোরে বলা সঠিক ছিল নাকি আস্তে বলা? কবরে বা বারযাখে তথা কেয়ামত কায়েম হবার পূর্ববর্তী জীবনেও এ-সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন করা হবে না।'

তারপর হযরত শাহ কাশ্মীরী রহ. বললেন, 'আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহ কাউকে অপদস্থ করবেন না। যাঁদের আল্লাহ তাআলা দ্বীনের ইলম প্রদান করে অনুগ্রহ করেছেন, যাঁদের সাথে তাঁর বান্দাদের বড় একটা অংশকে সম্পৃক্ত করেছেন, যাঁরা হেদায়েতের আলোকমালা চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাঁদের পুরোটা জীবন ব্যয় হয়েছে সুন্নতের আলো চারদিকে প্রজ্বলন করার খেদমতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের কাউকে অপমান-অপদস্থ করবেন না। হাশরের ময়দানে তাঁদের সবার সামনে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা করাবেন না যে, আবু হানিফা রহ. সঠিক বলেছিলেন আর শাফেয়ী রহ. ভুল বলেছিলেন। অথবা তার উল্টোটা হয়েছিল। তো যে জিনিসের জন্য দুনিয়া, বারযাখ বা হাশরের মাঠে কোথাও জিজ্ঞাসিত হব

না তার পেছনে পড়ে নিজেদের জীবন নষ্ট করে দিলাম। নিজেদের সব শক্তি ক্ষয় করে দিলাম। আর যেটা ইসলামের সহীহ দওয়াত ছিল, সবার ঐকমত্য ও সর্বসম্মত ছিল এবং দ্বীনের যেসব প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে আহবান নিয়ে নবীগণ দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন, যে দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে আমরা আদিষ্ট ছিলাম এবং যেসব মন্দ কাজ নিশ্চিহ্ন করা ও মিটিয়ে ফেলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল সেগুলোর কোনোটিই আমরা যথাযথ ভাবে করতে পারিনি। যেসব মন্দকাজ প্রতিহত করা আমাদের কর্তব্য ছিল সেগুলো আজ বিস্তার লাভ করছে। ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ছে। ধর্মদ্রোহিতার অনুপ্রবেশ ঘটছে। শিরক ও মূর্তিপূজা চলছে। হালাল-হারামের পার্থক্য মুছে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা ডুবে আছি শাখাগত মাসআলার তর্ক-বিতর্কে।’

তারপর তিনি বললেন, সেজন্যই চিন্তিত হয়ে বসে বসে অনুভব করছি যে, জীবনটাকে তো অনর্থক শেষ করে দিলাম।

সালাফে সালেহীনের মধ্যে মতানৈক্য হলে কী করতে হবে?

যেসব মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম থেকে দুই রকম মতামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য হলো,

احد القولين خطاء و المأثم فيه موضوع

অর্থাৎ, ‘পরস্পরবিরোধী দুই মতের একটা অবশ্যই ভুল। তবে সেই ভুলের জন্য কোনো গুনাহ হবে না।’[৪]

ইমাম মালেক রহ.কে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতানৈক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন,

في ذالك خطأ و صواب فانظر

অর্থৎ, কিছু আছে ভুল আর কিছু সঠিক। সুতরাং আমলকারী আহলে ইলমের কাজ হলো, চিন্তা-ভাবনা করে কোনো একদিককে নির্ধারণ করে নেওয়া।[৫]

---

৪ *জামিউ বয়ানিল ইলম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০৯

৫ *জামিউ বয়ানিল ইলম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০৫

ইমাম মালেক রহ. এর এই বক্তব্যের মাধ্যমে যেমনিভাবে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের একদিক সহীহ আর অন্য দিক ভুল হয়ে থাকে; পরস্পরবিরোধী দুইটি জিনিস একসাথে সহীহ হতে পারে না, তেমনিভাবে তিনি এটাও বলে দিয়েছেন যে, এই মতানৈক্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিবাদ-বিরোধে জড়ানো বিলকুল জায়েয নেই। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট, যার ব্যাপারে মনে হবে যে সে ভুল করছে তাকে কোমলকণ্ঠে সতর্ক করতে হবে। তারপর সে মেনে নিলে ভালো। অন্যথায় চুপ থাকতে হবে। ঝগড়া ফাসাদ বা গালিগালাজ করা যাবে না। ইমাম মালেক রহ. এর পুরো বক্তব্যটা নিম্নরূপ,

كان مالك يقول: المراء و الجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد و قيل له: رجل له علم بالسنة فهو يجادل عنها، قال : ولكن ليخبر بالسنة فإن قبل منه و إلا سكت

অর্থাৎ, ইলমী বিষয়ে বিবাদ-বিরোধ বান্দার অন্তর থেকে ইলমের নূর ছিনিয়ে নেয়। কেউ জিজ্ঞেস করল, 'যার সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, সে কি সুন্নাহর হেফাজতের জন্য বিবাদে লিপ্ত হতে পারবে?' তিনি বললেন, 'না, বরং তার কর্তব্য হলো লোকদের সঠিক বিষয়ে জানানো। তারপর তারা তা গ্রহণ করে নিলে তো ভালোই। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করবে। বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকবে।'

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান সাইরাফী রহ. একবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, 'সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মাসআলা নিয়ে মতানৈক্য হয়ে গেলে আমাদের জন্য কি জায়েয আছে যে আমরা চিন্তা-গবেষণা করে যেকোনো একজনের বক্তব্যকে সঠিক বলে সিদ্ধান্ত দেব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে লোকদের চিন্তা-গবেষণার কোনো সুযোগ নেই।' সাইরাফী রহ. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কোন মতের উপর আমল করা হবে?' তিনি বললেন, 'যাকে মন চায় তার অনুসরণ করবে।'[৬]

---

৬ *জামিউ বয়ানিল ইলম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০৯

ঘটনাটির আরবী বর্ণনা নিম্নরূপ :

قال محمد بن عبد الرحمن الصيرفي: قلت لأحمد بن حنبل، إذا اختلف أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم في مسئلة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب فنتبعه؟ فقال لي: لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم، فقلت: فكيف الوجه في ذالك؟ قال: تقلد ايهم احببت

মুজতাহিদ ইমামদের উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ. আর ইমাম মালেক রহ. এর নীতি তো এই বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মাসআলায় পারস্পরিক মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামের কর্তব্য হবে, দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে যার মতকে সুন্নাহর বেশি কাছাকাছি মনে হবে তার মতকে গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছে তারও কোনো প্রয়োজন নেই। বরং দুই দিকেই যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মতামত পাওয়া যাচ্ছে তাই দু'টোর যেকোনো একটা গ্রহণ করাই যথেষ্ট বলে তিনি মনে করতেন।

একবার হযরত উবাই ইবনে কাব রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর মধ্যে কোনো এক মাসআলায় মতানৈক্য হলো। উমর রাযি. তা জানতে পেরে ক্রোধান্বিত হয়ে বের হয়ে এলেন এবং বললেন, 'আফসোস! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এমন দুইজন পারস্পরিক মতানৈক্যে লিপ্ত, যাদের দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং যাদের থেকে মানুষ দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে।' তারপর তিনি তাঁদের বিরোধকে এভাবে মিটিয়েছেন,

قد صدق أبي و لم يأل إبن مسعود و لكني لم أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا و كذا

অর্থাৎ, 'উবাই ইবনে কাব রাযি. এর সিদ্ধান্ত তো সঠিক, বাকি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে কোনো অলসতা করেননি।' তারপর বললেন, 'আগামীতে যাতে আর কাউকে এমন বিবাদে জড়াতে না দেখি। অন্যথায় এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।'[৭]

হযরত উমর ফারুক রাযি. এর কথা দ্বারা বোঝা গেল, মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলাতে একটা মতই সহীহ ও সঠিক। তবে অন্য মত সহীহ না হলেও সেটা অবশ্যই নিন্দনীয় নয়।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় বুঝে এল। তা হলো, এই জাতীয় মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া অনুসরণীয় আহলে ইলম ব্যক্তিদের জন্য সমীচীন নয়। কারণ, এতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সমূহআশঙ্কা থাকে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর একটা দীর্ঘ কথা উল্লেখ করে ইমাম ইবনে আব্দুল বার্র রহ. বলেন, 'ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এই কথার দলিল রয়েছে যে, মুজতাহিদ ইমামগণের নিজেদের মধ্যে একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করা উচিত নয়।' অর্থাৎ এই জাতীয় বিষয়ে 'আপনি নিশ্চিত ভুলের উপর রয়েছেন' এরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এর কারণ হলো, এ ধরনের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় কারও কাছেই এমন জ্ঞান থাকে না যার ভিত্তিতে তিনি নিজের মতকে নিশ্চিত সঠিক আর অন্যের মতকে ভুল বলে সাব্যস্ত করতে পারেন।

ইজতিহাদ ও চিন্তা-ফিকির করার পর যদি কোনো মাসআলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তবে তাকে নিশ্চিত সঠিক বলা যায় না। বরং 'নিজের মতটি ভুল হবার আশঙ্কার সাথে সঠিক আর অন্যের মতটি সঠিক হবার সম্ভবনার সাথে ভুল' এমনটা মনে করতে হবে।

মূলকথা হলো, মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট আল্লাহর ইলম অনুযায়ী দুই মতের যেকোনো একটাই সঠিক। তবে সেটা নিশ্চিত করে বলার মতো চূড়ান্ত জ্ঞান কারও কাছে নেই। বরং উভয় দিকে সঠিক-বেঠিকের সমান সম্ভাবনা থেকে যায়। সেখান থেকে

৭ *জামিউ বয়ানিল ইলম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০৯

মুজতাহিদ ইমাম যেকোনো এক দিককে প্রাধান্য দিয়ে আমল করার জন্য নির্বাচন করে নেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন প্রধান মুহাদ্দিস, উস্তাযুল আসাতেযাহ মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. একবার বলেছিলেন, 'ইজতিহাদি মাসায়েল ও তৎসংশ্লিষ্ট মতানৈক্য, যার মধ্যে আমরা অধিকাংশ আহলে ইলম ডুবে আছি এবং ইলমের পুরো শক্তি এর পেছনে খরচ করে দিচ্ছি, এর চূড়ান্ত ফয়সালা দুনিয়াতে তো সম্ভবই নয়, আমার ধারণায় হাশরের ময়দানেও এটা জানা যাবে না। কেননা, দয়াময় আল্লাহ যখন দুনিয়াতে একজন মুজতাহিদ ইমামকে ভুল করা সত্ত্বেও এক নেকী প্রদান করে সৌভাগ্যবান করেছেন এবং তাঁর ভুলকে আবৃত রেখেছেন, সেই তিনিই কী করে হাশরের মাঠে স্বীয় দরবারে তাঁর সেই ভুলকে সবার সামনে প্রকাশ করে তাঁকে লজ্জিত ও অপমানিত করবেন? এটা অসম্ভব বলে মনে হয়।'

এই কথার খোলাসা হলো, যেসব মাসআলায় সাহাবা-তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামদের দৃষ্টিভঙ্গিগত মতানৈক্য হয়েছে তার চূড়ান্ত ফয়সালা দুনিয়া-আখেরাতে কোথাও হবে না। কেননা, আমলকারীকে এই বিষয়ে প্রত্যেকটা মতের উপর তার দলিল অনুযায়ী আমল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যে এই অনুযায়ী আমল করল সে কর্তব্য থেকে রেহাই পেল। উম্মাহর ঐকমত্যে তাকে দায়িত্বহীন বলা যাবে না। এই সমস্ত মাসআলাতে কোনো আলেম যতই গবেষণা করুক তার সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত পর্যায়ের সঠিক বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী রহ. বলেছেন, যেসব মাসআলায় সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে সেটা কিয়ামত পর্যন্ত দূর করা সম্ভব নয়। কারণ এটাকে দূর করার একটাই পদ্ধতি আছে। সেটা হলো, এই বিষয়ে এক দলকে নিশ্চিত সঠিক আর অপর দলকে নিশ্চিত বেঠিক সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

মুজতাহিদ ইমামদের মতানৈক্যে মন্দ কিছু নেই

উল্লেখিত বিষয়গুলোর আলোকে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, যেসব মাসআলায় সাহাবী-তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোনোটিকে নিন্দা করা যাবে না। কেননা, উভয় মতের ভিত্তিই হলো কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতি। এ কারণে উভয় দিকই প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে। বেশির চেয়ে বেশি একটাকে বেশি উত্তম এবং অপরটাকে কম উত্তম বলা যেতে পারে। এই কারণে বিরোধপূর্ণ এসব মাসআলার ক্ষেত্রে কারও উপর সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মতো গুরুদায়িত্ব বর্তায় না। বরং মন্দ নয় এমন কাজের উপর নিন্দাভাব প্রকাশ করাও নিন্দনীয়।

এই কারণে সালাফে সালেহীনের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না, যেখানে তাঁরা অসংখ্য মাসআলাতে হারাম-হালাল, জায়েয-নাজায়েযের মতো বিপরীতধর্মী মতানৈক্য হবার পরেও একে অপরের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ জানিয়েছেন যেমনটা মন্দকাজের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। অথবা একে অপরকে ও তার অনুসারীদের গোমরাহ, ফাসেক, পাপী বলে সম্বোধন করেছেন। অথবা তাকে দায়িত্বহীন ও হারাম কাজে লিপ্ত বলে অভিহিত করেছেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার্র রহ. ইতিপূর্বে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর যে উক্তি বর্ণনা করেছেন সেটাও এই বিষয়টিকে সমর্থন করে যে, এক মুজতাহিদের জন্য অপর মুজতাহিদের ছিদ্রান্বেষণ করা কখনোই সমীচীন নয়।

ইজতিহাদের শর্তাবলি

ইমাম শাফেয়ী রহ. যেখানে মুজতাহিদদের একে অপরের দোষ তালাশ করাকে নাজায়েয বলেছেন সেখানেই তিনি এর যৌক্তিক কারণ এবং একটি শর্তও উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনাটি এমন,

و في هذا من قول الشافعي دليل علي تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد أدي ما كلف باجتهاده اذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس و كان ممن له أن يجتهد و يقيس

অর্থাৎ, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর কথার মধ্যে এই বিষয়ে দলিল রয়েছে যে, এক মুজতাহিদ অপর এক মুজতাহিদকে ভুল সাব্যস্ত করার অধিকার রাখেন না। কেননা, তাদের প্রত্যেকেই নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে শর্ত হলো তার মাঝেও কেয়াসের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকতে হবে এবং তাকে ইজতিহাদ ও কেয়াস করার অধিকারী হতে হবে।[৮]

এই কথা থেকে বুঝে আসে, দুইটি মতভেদপূর্ণ বিষয়ের উভয়টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং একে মন্দ মনে না করা এবং সেই মতের অনুসারীদের বিপথগামী সাব্যস্ত না করা শুধু সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে শর্ত মেনে বিশুদ্ধ পন্থায় ইজতিহাদ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের সেসব মূর্খতাকে ইজতিহাদ হলে হবে না, যেখানে যিনি মুজতাহিদ সেজেছেন তার আরবী ভাষার জ্ঞান নেই। কুরআন-হাদীসের সাথে সুগভীর সম্পর্কও নাই। শুধু কিছু বাংলা বা উর্দু কিংবা হিন্দি-ইংরেজি অনুবাদের সহায়তা নিয়ে সে কুরআন-হাদীসের রহস্য উদ্‌ঘাটনে নেমে পড়েছে। এই জাতীয় ইজতিহাদ বড় ধরনের গুনাহ। এর থেকে সৃষ্ট মতামত গুনাহ, গোমরাহি এবং বিভেদ-বিচ্ছেদের কারণ। একে প্রতিহত করা অবশ্যকর্তব্য।

সুন্নাত-বেদআতের দ্বন্দ্ব

আমাদের সমাজে ধর্মের নামে চলা মতানৈক্যগুলোর একটা হলো সেটা, যা সুন্নাত ও বেদআতের খোলসে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক লোক কুরআন-সুন্নাহর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ-মূলনীতিকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যার ফলে প্রতিনিয়তই নিত্য-নতুন মাসআলার জন্ম

---

৮ *আওজাযুল মাসালিক শরহে মুয়াত্তা মালেক*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫

হচ্ছে। এই ধরনের মতানৈক্য নিঃসন্দেহে সেসব দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতার অন্তর্গত হবে, যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এটাকে মিটিয়ে ফেলা বা কমিয়ে আনার উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু কুরআনে কারীম এর জন্য একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আমাদের বাতলে দিয়েছে। যার মাধ্যমে দলাদলি কমে আসবে বৈ বৃদ্ধি পাবে না।

এটা কল্যাণের পথে দাওয়াত দেওয়ার সেই চিরচেনা মূলনীতি, যার মধ্যে শুরুতেই রয়েছে হেকমত ও প্রজ্ঞার উপদেশ। তারপর কল্যাণকামিতা, সহমর্মিতা ও কোমল ভাষায় কুরআনুল কারীমের সঠিক শিক্ষার প্রতি আহবান জানানোর শিক্ষা এবং সবশেষে مجادلة بالتي هي أحسن তথা দলিল-প্রমাণের সহায়তায় বুঝানোর চেষ্টা করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল সাধারণ আহলে ইলম এবং সংস্কারে আগ্রহী ব্যক্তিরা এই মূলনীতির প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ করেন না। তার স্থলে বিবাদে জড়িয়ে শরীয়ত বহির্ভূত পদ্ধতিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে উপহাস ও তাচ্ছিল্যের পথ বেছে নেন। প্রতিপক্ষকে হেয় করার জন্য সত্য-মিথ্যা, জায়েয-নাজায়েয সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। যার ফলে ঝগড়া-বিবাদের ময়দান রমরমা হলেও মানুষের সংশোধনের বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায়।

বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ

আমি প্রাথমিক আলোচনাকে এত লম্বা ও দীর্ঘ করেছি এই জন্য যে, ইলমের ধারক-বাহক উলামায়ে কেরাম, সমাজ-সংস্কারক এবং দ্বীনের খাদেমদের মধ্যে বর্তমানে পারস্পরিক যে বিচ্ছিন্নতা দেখা যাচ্ছে তা সাধারণত এসব কারণেই হচ্ছে। এখন আমি ঐসব কারণ উল্লেখ করব যা আমার জানামতে মুসলিমদের পারস্পরিক বিভেদ-বিচ্ছেদের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে আফসোসের বিষয় হলো, এগুলোকেই বর্তমানে দ্বীনের সবচেয়ে বড় খেদমত মনে করা হচ্ছে।

শাখাগত মাসআলায় বাড়াবাড়ি

আমার মতে এই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার একটা কারণ হলো, শাখাগত ও ইজতিহাদি মাসআলাতে বাড়াবাড়ি করা এবং নিজের পছন্দকৃত আমলের বিপরীতটাকে বাতিল বলে মনে করা। এর সাথে সেই মতের উপর আমলকারী ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা যা বাতিল ও গোমরাহ লোকদের বেলায় করা উচিত ছিল। যে বিষয়ে পুরো উম্মতের ইজমা রয়েছে এবং যুক্তির বিচারেও দ্বীন পালন করার জন্য এছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই; সেটা হলো, যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রাখে না সে মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলাতে একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করবে। যারা ইচ্ছাধীনতা ও প্রবৃত্তিপূজা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দ্বীনী কল্যাণ মনে করে কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করাকে বেছে নেয়, কুদরতিভাবে তারা একটি জামাতে পরিণত হয়। এমনিভাবে আরেক মুজতাহিদের অনুসরণকারীরাও আরেকটি জামাতের আকার ধারণ করে। আলাদা জামাতে বিভক্ত হওয়াটা যদি শুধু ইজতেহাদি মাসায়েলের সীমায় থেকে তালীম ও আমলকে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে এতে কোনো সমস্যা নাই। একে বিচ্ছিন্নতা বা উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর বলা যায় না। সমস্যা তো হয় তখন, যখন ভিন্নমতের লোকদের সাথে বিবাদে জড়ানো হয় এবং নিজেদের পুরো সময়-শ্রম ও শক্তি-সামর্থ্য শাখাগত মাসায়েলের আলোচনায় ব্যয় করা হয়। যদিও ইসলামের মৌলিক এবং অকাট্য বিষয়গুলো ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা পৃথিবীতে প্রসারিত হচ্ছে। এই সব জিনিস থেকে চোখ সরিয়ে এখন আমাদের ইলমী ব্যস্ততা শাখাগত মাসায়েলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা কিছুক্ষণ আগে করেছি। সেখানে বলা হয়েছিল এই বিষয়ে শত চেষ্টা করলেও এরচেয়ে বেশি বলার সুযোগ নেই যে, একটি উত্তম আর তার বিপরীতটা অনুত্তম। এই উত্তম-অনুত্তম হওয়ার বিষয়টা আবার দুনিয়ার বিচারে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুযোগ নেই। কবরেও এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। হাশরের মাঠেও এই সম্পর্কে কিছু জানানো হবে না। এমনিভাবে এসব মাসাআলাতে যারা মতানৈক্য করেছে তাদের ভর্ৎসনা করাও জায়েয নয়। তাদের ভুল বা গুনাহগার বলারও সুযোগ নাই। বর্তমান সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উলামা ও

ফুকাহায়ে কেরাম, বিশেষ করে যারা পঠন-পাঠন ও লেখালেখির সাথে যুক্ত আছেন তাদের সকাল-সন্ধ্যার কর্মব্যস্ততার খোঁজ নিলে দেখা যাবে অধিকাংশেরই ইলমী গবেষণা ও চেষ্টা-পরিশ্রমের সিংহভাগই এসব শাখাগত মাসআলাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

বিভিন্ন দলের চিন্তাগত দ্বন্দ্ব

এর মধ্যে কোনো কোনো হযরতের বাড়াবাড়ি তো এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভিন্নমতের লোকদের নামাযকে ফাসেদ এবং তাদের কুরআন-সুন্নাহর প্রতি অবহেলাকারী আখ্যায়িত করে নিজের মতের প্রতি এমনভাবে দাওয়াত দেন, মনে হয় যেন কোনো ইসলাম অস্বীকারকারীকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি এটাকে দ্বীনের বড় খেদমত বলে মনে করছেন। অথচ চতুর্দিক হতে ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করতে যেসব ঝড়-তুফান ধেয়ে আসছে সে সম্পর্কে তিনি পুরোই বেখবর অথবা জানা থাকলেও চোখ বুজে পড়ে আছেন।

একদিকে প্রকাশ্য কুফর, খ্রিস্টবাদ এবং কমিউনিজম সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে নিচ্ছে এবং ঝড়ের গতিতে সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে। শুধু পাকিস্তানেই প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ধর্মত্যাগী হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে কুফর, নেফাক এবং ধর্মদ্রোহিতা মুসলিম নামধারীদের মধ্যেই কাদিয়ানিয়্যাতের ছদ্মাবরণে, পারভেজিয়্যাত বা হাদীস অস্বীকারের মোড়কে, পাশ্চাত্য হতে আগত প্রগতিশীলতা ও সব ধরনের অবৈধ জিনিসকে বৈধ সাব্যস্ত করার পন্থায় আমাদের মহামূল্যবান ঈমানহরণে ব্যস্ত। এই দ্বিতীয় প্রকার পূর্বোক্ত প্রথম প্রকারের চেয়ে এই কারণে বেশি বিপজ্জনক যে, এটি কুরআন ও ইসলামের শ্লোগান গায়ে জড়িয়ে আগমন করে। যার ফাঁদে সাদাসিধা মুসলিমরা তো বটেই, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত নব যুবকরাও আটকা পড়ে। এর কারণ হলো, আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক সভ্যতা তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও মৌলিক বিষয় থেকে এত দূরে সরিয়ে ফেলেছে যে, তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এসব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কুফুরি থেকে সৌভাগ্যক্রমে যদি কিছু মুসলিম বেঁচে যায় তো তারাও

বেহায়াপনা-উলঙ্গপনা, যাত্রা-পালা এবং প্রত্যেক ঘরে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে গান-বাজনা ও সিনেমার বিষাক্ত ছোবল থেকে বাঁচতে পারছে না। ইসলাম ও কুরআনের পরিচয়ে বড় হওয়া মুসলিম বর্তমানে সব ধরনের পাপাচার এবং অসচ্চরিত্রের মাঝে ডুবে আছে। আমাদের বাজারগুলো মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, সুদ-জুয়া ইত্যাদিতে ডুবে আছে। এগুলো কোনো হিন্দু বা ইহুদি পরিচালনা করছে না। বরং নামধারী কিছু মুসলিমই করছে। আমাদের সরকারি আদালতগুলো ঘুষ, জুলুম-অত্যাচার, ফাঁকিবাজি, নির্দয়তা ও নির্মমতার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এসবের আদেশদাতারাও কোনো ইংরেজ বা হিন্দু নয়, বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুখে নেওয়া, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিমরাই। সাধারণ মানুষে ইলমে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কাদাপানিতে ডুবে আছে। ফরজ-ওয়াজিব সম্পর্কে তারা গাফেল এবং মুশরিকানা রীতি-নীতি, খেল-তামাশার প্রতি আসক্ত হয়ে আছে। এই অবস্থায় এটা কি আমাদের কর্তব্য নয় যে, আমরা খুব সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেব এবং চিন্তা-ভাবনা করে দেখব যে, এই মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের নির্দেশনা ও আমাদের কাছে তার প্রত্যাশা কেমন হতো! যদি তিনি আমাদের হাশরের মাঠে জিজ্ঞেস করেন, আমার দ্বীন ও শরীয়তের উপর তো বড় বড় হামলা হচ্ছিল, আমার উম্মত দুর্দশায় আক্রান্ত ছিল তখন তোমরা যারা নববী উত্তরাধিকারের দাবিদার তারা কোথায় ছিলে? এই উত্তরাধিকারের কী হক তোমরা আদায় করেছ? তখন কি আমাদের জন্য এই উত্তরপ্রদান যথেষ্ট হবে যে, আমরা রফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা বিষয়ে একটা কিতাব রচনা করেছিলাম এবং কিছু ছাত্রকে *শরহে জামী* কিতাবের হাসেল-মাহসুল ভালো করে বুঝিয়েছিলাম অথবা হাদীসের ভেতরকার মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছিলাম কিংবা কলমের জোরে ও ছলে-বলে-কৌশলে ভিন্নমতের আলেমদের খুব হেয় ও তুচ্ছ করেছিলাম?

আপন সীমায় ইখলাসের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ে থাকলে শাখাগত মাসায়েল নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা নিন্দনীয় কিছু নয়। কিন্তু যখন আমরা ইসলাম ও ঈমানের ভিত্তিমূলকে নড়বড়ে করে দেওয়ার মতো ফিতনার ধেয়ে আসার সংবাদ শুনতে পাচ্ছি, নিজ চোখে আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের হুকুম-আহকাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে দেখছি কিন্তু সেটা আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করছে না। সুতরাং কী করে আশা করা যায় যে, শাখাগত মাসায়েলের আলোচনা আমরা ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য করছি? যদি সত্যিই এর মধ্যে লিল্লাহিয়্যাত ও ইখলাস থাকত তাহলে এই অবস্থায় আমরা ইসলাম ও দ্বীনের দাবি-দাওয়া বুঝতে পারতাম এবং শাখাগত বিষয়ের তুলনায় মৌলিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতাম। অথচ আমরা শাখাগত বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই ইলমী ও দ্বীনী খেদমতকে সীমাবদ্ধ মনে করে বসে আছি। নিজেদের সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও প্রয়াস-পরিশ্রম এর পেছনেই ব্যয় করে যচ্ছি। অন্যদিকে ইসলামে মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয়াদি এবং ঈমানের সীমান্তকে দুশমনদের আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। লড়াই করার কথা ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে অথচ আমরা লড়াই করছি কিসের বিরুদ্ধে! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন! এটাই হলো গোঁড়ামি আর বাড়াবাড়ির প্রতিফল।

এর পাশাপাশি আরেকটি বড় ভুল হলো, আমরা এসব মতানৈক্যপূর্ণ মাসায়েলের গণ্ডি পেরিয়ে পারস্পরিক দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা এবং একে অপরকে হেয় ও তুচ্ছ করা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছি। এটা কোনো ধর্মেই অনুমোদিত নয়। দুঃখের কথা হলো, এগুলো সবই দ্বীনের খেদমতের নামে করা হচ্ছে। আর এসব কর্মকাণ্ড যখন সেসব আলেম-উলামার অনুসারী সাধারণ মানুষদের পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন তারা একে একপ্রকারের 'জিহাদ' মনে করে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। আর এটা খুবই সুস্পষ্ট, যেই জাতি নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাদের পক্ষে দস্যু-দুশমনকে প্রতিহত করা এবং কুফর ও ধর্মদ্রোহিতাকে প্রতিরোধ করা কখনো সম্ভব হয়ে ওঠে না। কুরআন-হাদীসে সীমালঙ্ঘনকারী এসব বিষয়কেই দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা বৈধ মতানৈক্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ, 'তামরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো।'[৯]

অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীগণের প্রতি একটি অসিয়তের বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে,

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

অর্থাৎ 'তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।'[১০]

তাফসিরের ইমাম আবুল আলিয়া রহ. বলেন, 'দ্বীন প্রতিষ্ঠা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইখলাস। আর 'দলাদলি কোরো না' মানে হলো, পরস্পরে শত্রুতাভাব পোষণ না করে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকো। এই নির্দেশনামার পর বনী ইসরাঈলের দলাদলির কথা উল্লেখ করে মুসলিমদের সর্তক করা হয়েছে। যাতে তারা ওদের পথে পা না বাড়ায়। সেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ, 'অবগত হওয়ার পরই তারা নিজেদের মাঝে বিদ্বেষবশত মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে।'[১১]

ইমাম আবুল আলিয়া এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, بغيا بينهم শব্দের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মতানৈক্যে জড়িয়ে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হওয়া কখনো দ্বীনের কারণে হয় না। বরং এটা দুনিয়ার প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও চাকচিক্য লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

بغيا علي الدنيا و ملكها و زخرفها و زينتها و سلطانها

অর্থাৎ, এই শত্রুতার কারণ নিয়ে ভাবলে দেখা যাবে, এর পেছনে দুনিয়ার মোহ, পদ ও মালের প্রতি ভালোবাসা ক্রিয়াশীল। যাকে শয়তান দ্বীনের খেদমতের মোড়কে উপস্থাপন করেছে। অন্যথায় এই জাতীয় মাসায়েলের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার সীমারেখা ততটুকুই, যা

---

৯ সূরা আল ইমরান (০৩) : ১০৩
১০ সূরা শুরা (৪২) : ১৩
১১ সূরা শুরা (৪২) : ১৪

আগে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমল করার ক্ষেত্রে যেকোনো একদিককে উত্তম মনে করে গ্রহণ করা এবং ভিন্নমতের লোকদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া। এর দৃষ্টান্ত হলো, দুনিয়াতে মানুষ যদি অসুস্থ হয় তাহলে নির্দিষ্ট একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। তার উপর ভরসা করে তার প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলে। কিন্তু ভিন্ন ডাক্তারের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না। এর আরেকটা দৃষ্টান্ত হলো, আমরা মামলা মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে উকিল হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পুরো বিষয়টি তার হাতে ছেড়ে দিই। কিন্তু অন্যান্য উকিলের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হই না। মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় আমাদের কর্মপন্থা এমনটাই হওয়া উচিত।

বিভিন্ন দলের সীমালঙ্ঘন

আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় দল রয়েছে। সেগুলো দ্বীনের তালিম-তরবিয়ত এবং সমাজ-সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থানে কল্যাণকর খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। সেখানে অনেক উলামা-ফুকাহা ও নিষ্ঠাবান লোক কাজ করে যাচ্ছেন। এঁরা সবাই একত্রিত হয়ে যদি দ্বীনের ভেতর সৃষ্ট দলাদলিকে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং যথাসম্ভব একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করেন, দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত প্রত্যেক গোষ্ঠী পরস্পরকে বন্ধু ও সহযোগী মনে করেন, অন্যদের কাজকে নিজেদের কাজের মতোই মূল্যায়ন করেন তাহলে এই বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ম-নীতিতে আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বিশাল বড় এক শক্তিতে আবির্ভূত হতে পারে। তারা এভাবে কর্মবণ্টনের মাধ্যমে সহজেই অনেক দ্বীনী প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম।

কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের নির্ধারিত নিয়ম-নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যেই দ্বীনী খেদমতকে সীমাবদ্ধ মনে করেন। যদিও মুখে মুখে তেমন কিছু বলেন না এবং অন্যদের সাথে সরাসরি ঝগড়া-বিবাদও করেন না, তবুও শ্রদ্ধাবোধের কমতি অবশ্যই দেখা যায়। যার ফলশ্রুতিতে সেই গোষ্ঠীর মাঝে একধরনের দলাদলির উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। চিন্তা করলে এর যে কারণ উদ্ভাসিত হয় তা হলো, যদিও সবার উদ্দেশ্য দ্বীনের প্রচার-প্রসার, দ্বীনের হেফাজত এবং মুসলিমদের

ইলমী-আমলী ও আখলাকী সংশোধন; এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে গিয়ে কেউ বড় কোনো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দ্বীনী শিক্ষা সংরক্ষণে উদ্যোগী, কেউ তাবলিগী জামাত গঠন করার মাধ্যমে হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালনরত, কেউ সংঘ তৈরি করে লেখনীর মাধ্যমে ধর্মীয় হুকুম-আহকাম প্রচার-প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। কেউ মানুষের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানে দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করছেন। কেউ ইসলামবিরোধী ধর্মদ্রোহী ও তাদের ছড়ানো সংশয়-সন্দেহের নিরসনকল্পে সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রচারের কাজে নিয়োজিত। তো এ সকল কাজ যদিও ধরনের দিক দিয়ে ব্যতিক্রম কিন্তু বাস্তবে সেগুলো একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একাধিক মাধ্যম। নানারকম কর্মক্ষেত্রের এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রত্যেকের কাজের ধরন আলাদা হওয়া এবং কাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য নিজেদের রুচি-অভিরুচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করা ও নীতিমালা তৈরি করা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। প্রত্যেক দলের ক্ষেত্রেই এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

এটি জানা কথা যে, সবার মূল উদ্দেশ্য কুরআন-হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রত্যেকে যে আলাদা আলাদা কর্মপন্থা ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছে সেটা সরাসরি অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। এবং তার অনুসরণও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। বরং প্রত্যেক গোষ্ঠীর জিম্মাদার লোকেরা কাজের সহজার্থে সেসব নিয়ম-নীতি গ্রহণ করেছেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজন হলে তারা তাতে পরিবর্তন করে থাকেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পূর্বোক্ত নীতিমালা পরিবর্তন করে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করাও কারও কাছে অপছন্দনীয় নয়। কিন্তু এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন প্রায় প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যেই পাওয়া যায়। তারা নিজেদের তৈরি করা নিয়ম-নীতিকে সরাসরি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত অকাট্য বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। যদি কোনো ব্যক্তি সেই কর্মপন্থার সাথে যুক্ত না হয় তাহলে তিনি যত বড় দ্বীনী খেতমতই করুন না কেন তাকে নিজেদের ভাই ও সহযোগী মনে করেন না। আর যদি পূর্ব থেকে কেউ সেই কর্মধারায় শরীক থাকার পর কোনো কারণে পরবর্তীতে তাতে আর যুক্ত না থাকেন তাহলে তাকে মূল উদ্দেশ্য ও দ্বীন থেকে বিচ্যুত বলে মনে

করা হয়। তার সাথে এমন আচরণ করা হয় যেন সে কোনো ধর্মত্যাগী। যদিও ঐ ব্যক্তি আগের চেয়েও জোর কদমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করে। এসব বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের মূলে রয়েছে দলাদলির মনোভাব ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। জাহেলী পক্ষপাতিত্বে লিপ্ত লোকদের এই মন্দ স্বভাব আজ দ্বীনদার ব্যক্তিদের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে।

নবীদের দাওয়াতী পন্থাকে লক্ষ্য না করা

আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলাহী খেদমতকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দলাদলি ও ঝগড়া-ফাসাদের রাস্তাকে প্রশস্ত করার পেছনে যে বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে তা হলো, বর্তমান সময়ে লেখনী ও যবানীশক্তির অধিকারী আলেমরা সাধারণত দাওয়াত ও ইসলাহের ক্ষেত্রে নবীদের দাওয়াতী পন্থাকে লক্ষ্য না করে চালাকি ও কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কথাবার্তায় গাম্ভীর্য আনয়ন ও প্রভাব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় যে, এটি এমন একটি নিন্দনীয় পন্থা, যার মাধ্যমে কখনো কোনো গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সংশোধনের আশা করা যায় না। এই পদ্ধতি বরং ঐ ব্যক্তিকে আরও বেশি করে গোমরাহিকে আঁকড়ে ধরতে সহায়তা করে। সংশোধনীর পরিবর্তে তার অন্তরে দুশমনীর বীজ বপন এবং শত্রুতার অনল জ্বালিয়ে দেয়। এই পদ্ধতির দাওয়াতের ক্ষেত্রে ফায়দা শুধু এতটুকু হয় যে, নিজের কিছু ভক্ত-মুরিদ ও অনুসারীরা সাময়িকভাবে কিছু আনন্দের খোরাক পেয়ে থাকে। তাদের কিছু বাহবা আর পিঠ চাপড়ে দেওয়া থেকে তিনি ভাবেন, আমি তো দ্বীনের বিশাল খেদমত করে ফেলেছি! কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য করে এই লেখনী ও বক্তব্য প্রদান তাদেরর জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে, অনেক সময় এই বিষয়ে তার অন্তরে সত্য হওয়ার বিশ্বাস জন্ম নেওয়ার পরও ঠাট্টা-বিদ্রুপাত্মক উপস্থাপন তাকে সেই দাওয়াত গ্রহণের পথে বাধা প্রদান করে এবং চিরদিনের জন্য ওই দায়ীর প্রতি শত্রুতা পোষণকারীতে পরিণত করে।

এর বিপরীতে নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের পদ্ধতির প্রতি লক্ষ করুন। তাদের কথাগুলো সাদামাটা এবং সহমর্মিতা ও কোমলতামিশ্রিত

হয়ে থাকে। বিপক্ষীয়দের কঠোর-কঠিন মন্দভাষা শুনেও তাঁরা কোমল সুরে এর প্রত্যুত্তর প্রদান করে থাকেন। ছল-চাতুরির আশ্রয় না নিয়ে তাঁরা হৃদয়ভর্তি মুহাব্বাত ও আবেগ ধারণ করেন। যেভাবেই হোক মানুষ যাতে সত্য কথাকে গ্রহণ করে নেয় সেজন্য হেকমত ও সুকৌশল অবলম্বন করেন। নবীসুলভ দাওয়াতের মর্ম কুরআনের একটা শব্দ نذير এর মাধ্যমে বুঝে আসে। প্রত্যেক নবীর জন্যই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের نذير ও بشير বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। نذير শব্দের অনুবাদ উর্দু (ও বাঙলায়) ভীতিপ্রদর্শনকারী করা হয়। কিন্তু এই অর্থ শব্দটার পুরো মর্মকে প্রকাশ করে না। উর্দু (ও বাঙলা) ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে এই অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ভীতিপ্রদর্শন কয়েক ধরনের হতে পারে। চোর-ডাকাত এবং শত্রুও ভয়-ভীতি দেখায়। আবার একজন দয়াবান পিতাও তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু-আগুন ইত্যাদির ভয় দেখায়। প্রথম প্রকারের ভীতিপ্রদর্শনকে আরবীতে تخويف বলে। আর দ্বিতীয় প্রকারকে إنذار বা نذارة বলে। তাই চোর-ডাকাত আর হিংস্র জানোয়ারকে কখনো نذير বলা হয় না। যে দয়াবান ও স্নেহশীল পিতা তার পুত্রকে ভীতিপ্রদর্শন করে তাকে نذير বলে। নবী-রাসূলদের জন্য نذير শব্দ ব্যবহার করে মূলত তাদের দাওয়াতের ধরনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁরা শুধু বার্তাই পৌঁছান না বরং প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমে সেই বার্তাকে ক্রিয়াশীল ও প্রভাবক বানিয়ে সম্বোধিত ব্যক্তিকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচানোর পুরোপুরি প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে নববী দাওয়াতের মূলনীতি যে আয়াতের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে সেটা যেন এই نذير শব্দটিরই ব্যাখ্যা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ

অর্থাৎ ‘তোমার রবের পথে দাওয়াত দাও হেকমত ও সুন্দর বচনের মাধ্যমে। এবং তাদের জবাব দাও সর্বোত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করে।’[১২]

---

১২ সূরা নাহল (১৬) : ১২৫

এই আয়াতে আল্লাহর পথে দাওয়াতের যেসব আদব-কায়দা রয়েছে তারমধ্যে সর্বপ্রথম হেকমতের কথা বলা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো, একজন দাঈর কাজ শুধু এতটুকু নয় যে, তিনি একটা বার্তা শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন, বরং হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিস্থিতিতে এমন চমৎকার উপস্থাপনায় দাওয়াত দেবেন যে শ্রোতার জন্য তা গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় নীতি হলো, 'মাওইজায়ে হাসানা' অবলম্বন করা। এর মানে হলো, সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতার সাথে সৎকাজের প্রতি আহবান জানানো। এর দ্বারা বোঝা গেল, একজন দাঈর জন্য আবশ্যক হলো তিনি যা বলবেন তা যেন সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতাপূর্ণ হয়।

তৃতীয় হলো, উপস্থাপিত বক্তব্যকে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করা। কারণ, অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে শুধু সহমর্মিতা এবং কল্যাণকামিতার মাধ্যমে ভালো কাজের প্রতি আহবান জানানো সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, বর্ণনাভঙ্গি এবং শব্দ ও বাক্যচয়ন চিত্তাকর্ষক না হওয়ার কারণে দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না। এই জন্যই বক্তব্য সুন্দর ও মার্জিত এবং হৃদয়কাড়া হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

মোটকথা, এই আয়াতে নববী দাওয়াতের আদব বিষয়ে তিনটি জিনিসকে জরুরি বলা হয়েছে।

এক. হেকমত; যাতে করে দাওয়াতটা ক্রিয়াশীল হতে পারে।
দুই. সহমর্মিতা এবং কল্যাণকামিতার মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া।
তিন. দাওয়াতের ভাষা মার্জিত, সুললিত, কোমল ও সহনীয় হওয়া।

সর্বশেষ চতুর্থ আরেকটা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তা হলো, এই তিন বিষয়ের প্রতি যত্নবান হয়ে দাওয়াত দেওয়ার পরও যদি কেউ তা কবুল না করে এবং তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে সাধারণ মানুষদের মতো আচরণ যাতে না করা হয়। বরং সেই ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করতে হবে তা হলো, مجادلة بالتي هي أحسن অর্থাৎ উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের জবাব দিতে হবে। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, خطاب برفق و لين و حسن

অর্থাৎ সেই তর্ক-বিতর্কও নরম-কোমল গলায় এবং কল্যাণকামিতার ও মার্জিত ভাষায় হতে হবে। *তাফসীরে মাযহারী*তে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. বলেছেন, خطاب برفق و لين و حسن হলো, সেখানে নিজের রাগ-ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বা নিজের বড়ত্বভাব প্রকাশ করা যাবে না। বরং শুধু আল্লাহর জন্য সত্য কথাকে বুলন্দ করা উদ্দেশ্য হতে হবে। আর এটা শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, বরং অমুসলিমদের সাথেও যদি কখনো বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় হয় তখনো নবীগণকে এই মূলনীতি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

অর্থাৎ আহলে কিতাব কাফেরদের সাথে বিতর্ক করতে হলে তা উত্তম পদ্ধতিতে করবে।[১৩]

নবীগণের উত্তম আদর্শ

নবীগণের দাওয়াত ও সংশোধনের যেসব অসংখ্য ঘটনা কুরআন হাদীসে বিবৃত হয়েছে তার প্রত্যেকটা যদি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব, তাঁদের সারা জীবনের কর্মপন্থা এমনই ছিল। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম পঞ্চাশ একশো নয়, বরং নয়শত[১৪] বছর ধরে তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতার সাথে বোঝাচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর জাতি তার সাথে রূঢ় এবং অভদ্র আচরণ করেছিল। তাঁকে নির্বোধ ও বোকা আখ্যা দিয়েছিল। আপনি জানেন তখন তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন,

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১৩ সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৬

১৪ মূল কিতাবে নয়শত বছরের কথাই লেখা আছে। সঠিক হলো সাড়ে নয়শত বছর। (দেখুন, সূরা আনকাবুত (২৯) : ১৪)

অর্থাৎ 'হে আমার জাতি, আমার মাঝে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই। বরং আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত বার্তাবাহক।'[১৫]

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জিন্দেগীও এই কর্মপন্থাকে সমর্থন করে। তিনি কাফেরদের সব ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে তাদের জন্য বদদুআর পরিবর্তে কল্যাণ ও হেদায়াতের প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমার জাতিকে হেদায়াত দান করুন। তারা তো অবুঝ!'

যেসব আলেম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের ওয়ারিস হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাদের দাওয়াতের পদ্ধতিও এমনই ছিল। বালাকোটের শহীদ সাইয়্যিদ ইসমাঈল রহ. এর ঘটনা আছে যে, একবার তিনি দিল্লির জামে মসজিদে বয়ান করে বেরিয়ে আসছিলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন প্রতিপক্ষ তাঁকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমরা শুনেছি যে আপনি হারামজাদা। তিনি ধৈর্যধারণ করে তাদের প্রশান্তচিত্তে কোমলকণ্ঠে বললেন, ভাই আপনি ভুল শুনেছেন। আমার মায়ের বিবাহের সাক্ষী এখনো বেঁচে আছে। তার থেকে খোঁজ নিতে পারেন। তিনি আসলে জানতেন যে, এদের উদ্দেশ্য হলো তাঁকে গালি দিয়ে কষ্ট দেওয়া। তাই তিনি নবীর প্রকৃত ওয়ারিসের পরিচয় প্রদান করে তাদের পাল্টা গালি দেওয়ার পরিবর্তে বিষয়টিকে একটা মাসআলার আকার দিয়ে নিষ্পত্তি ঘটান।

নববী পদ্ধতি বনাম আমাদের পদ্ধতি

সত্যিকার বিষয় হলো, দাওয়াত ও ইসলাহের কাজ নবীগণ এবং তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরিরাই কেবল করতে পারে। যারা প্রতিটি পদক্ষেপেই কষ্ট করার ক্ষমতা রাখেন এবং শত্রুর সাথেও সদাচার ও সহমর্মিতার

---

১৫ সূরা আরাফ (০৭) : ৬৭

আচরণ করেন। তাদের চলন-বলন ভিন্নমতের লোকেদের আঘাত করা ও তাদের কুৎসা রটানো থেকে পবিত্র থাকে। তাঁরা ভিন্নমতের লোকদের প্রতিহত করতে ছল-চাতুরী ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয় না। তাদের উপর অপবাদ দেওয়ার ঘৃণ্য কৌশলও অবলম্বন করেন না। এর ফলশ্রুতিতেই অল্প কিছুদিন বিরোধিতা করার পর বড় বড় রথী-মহারথীও তাঁদের অনুগত হয়ে পড়ে। তাদের কথা মান্য করে। দুঃখের বিষয় হলো, নববী আদর্শ থেকে বর্তমানে আমরা এত দূরে সরে পড়েছি যে, আমাদের বক্তৃতা-ওয়াজ ও কলমের লিখনীতে তার বিন্দুমাত্র দেখা পাওয়া যায় না।

বর্তমান সময়ে প্রতিপক্ষকে বিভিন্ন রকমের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অপদস্থ করা এবং ধূর্ততার সাথে চালবাজি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করাই একজন দাঈ ও মুসলিহের সাফল্য মনে করা হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

আল্লাহ তাআলা যখন মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের মতো দৃঢ়চেতা নবীদের ফেরআউনের মতো উদ্ধত ও অহংকারী কাফেরের কাছে পাঠান তখন নির্দেশনা প্রদান করে বলেছিলেন,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

অর্থাৎ, তাকে নরম-কোমল কথা বলবে। এতে করে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।[১৬]

বর্তমানে আমাদের আলেম-উলামা ও দাঈদের মধ্যে কেউ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম থেকে বড় দাঈ ও দ্বীনের রাহবার নয়। তদ্রুপ যাদের কাছে তারা দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছেন তারাও ফেরআউনের চেয়ে বেশি গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট নয়। সুতরাং তাদের জন্য কীভাবে জায়েয হতে পারে যে, সামান্য মতের অমিলের কারণে প্রতিপক্ষের পেছনে উঠেপড়ে লাগবে। তার ক্ষতিসাধনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। কিংবা তদের নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করে বেড়াবে। এসব কাজ করে আবার মনে মনে এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আমি দ্বীনের অনেক বড় খেদমত করছি। মানুষের কাছেও প্রত্যাশা করবে, যাতে তারা তার এই খেদমতের স্বীকৃতি দেয়।

---

১৬ সূরা ত্বহা (২০) : ৪৪

আমার মতে বর্তমানে এই তিনটি বিষয় মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে দিচ্ছে না। এখন প্রত্যেক সম্মিলনই বিভক্তি এবং প্রতিটি সংগঠনই দলাদলির কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি ইসলাহের কাজে ফেতনা-ফাসাদ এবং প্রত্যেক দাওয়াতী খেদমতে ঘৃণা প্রকাশের মহড়া পরিলক্ষিত হয়। হায়! যদি আমরা সবাই মিলে একটু ভাবতাম! অন্যদের সংশোধনের চিন্তা করার আগে নিজেদের সংশোধনের চিন্তা করতাম! কারণ, প্রধান সমস্যা এটাই যে, সম্পদ ও পদ-পদবির ভালোবাসা এবং হিংসা-বিদ্বেষের নাপাকী থেকে আমাদের অন্তর পবিত্র নয়। আমাদের গর্ববোধ হয় এই বিষয়ের উপর যে, আমরা চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ, নাচ-গান, হাসি-তামাশা ও নাটক-সিনেমা থেকে মুক্ত থাকি এবং সালাত-সওম ঠিকঠাক আদায় করি। কিন্তু সমস্যা হলো, এসব পাপাচার থেকে আমাদের বিরত থাকা এবং ঠিকঠাক দৈনন্দিন ইবাদাতগুলো পালন করা নিজেদের হুজুরি লেবাস ধারণ করার কারণে নয় তো! কারণ এই পোশাকে ওসব পাপাচার করার সুযোগ নেই। অন্যথায় যদি শুধু আল্লাহর ভয়ে এসব থেকে বেঁচে থাকতাম, তবে সম্পদ ও পদ-পদবির লোভ এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার-লৌকিকতার মতো পাপ থেকে বেঁচে থাকতাম। কারণ, এসবের নাপাকী সুদ-ঘুষের নাপাকীর চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এই বাতেনী গুনাহগুলো আমাদের জুব্বা এবং পাগড়ির আড়ালে থাকে বলে হয়তো আমরা তেমন পাত্তা দিই না। মূলত এগুলোই হলো সর্বক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছেদ ও দলাদলির মূল কারণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে থাকার পূর্ণ তাওফিক দান করুন। আমীন! যাতে করে আমরা অন্তর দিয়ে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্টাচারকে সঙ্গী করে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি।

সারকথা

প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষেরই জানা আছে যে, বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মুসলমানেরা বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, পারস্পরিক দলাদলি ও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। অন্যথায় সংখ্যাধিক্যের

হিসাবে এবং পার্থিব উপকরণের বিচারে মুসলিমরা কখনোই এত উন্নত ও শক্তিশালী ছিল না। এই বিচ্ছিন্নতার কারণগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে ফলাফল বের হয়ে আসে তার অন্যতম কিছু হলো, আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত সম্পর্কে উদাসীনতা। অন্যান্য জাতির মতো দুনিয়ার পদ-পদবি, সম্পদ-রাজত্ব ও ইজ্জত-সম্মান লাভের লাগামছাড়া বাসনা। এগুলো আমাদের সমাজে অনেক সময় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য এবং ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার নিমিত্তে কিংবা পদ-পদবি অর্জনের লোভে পারস্পরিক লড়াইয়ের আকৃতিতে আমাদের সামাজিক ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। কখনো কখনো মাযহাবী ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং নিয়ম-নীতির ব্যবধান আমাদের একজনকে অপরজনের বিপক্ষে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও অপমান-অপদস্থের রাস্তাকে খুলে দিচ্ছে। অন্যথায় দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতো আমাদের লড়াইয়ের দৃষ্টি কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার প্রতি নিবদ্ধ থাকত এবং এগুলোকে প্রতিহত করতে মুসলিমদের বিভিন্ন জামাত এক কাতারে পায়ে পা মিলিয়ে ময়দানে নামত তাহলে কতই না ভালো হতো!

দায়িত্বশীল আলেমদের প্রতি ব্যথিত নিবেদন

রাজনীতি ও অর্থনীতির অঙ্গনে এবং পদ ও পদবির প্রতিযোগিতার ময়দানে যে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন হচ্ছে তার প্রতিকার করা তো আমাদের সাধ্যে নেই। কিন্তু দ্বীনি ও ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত দলগুলোর নীতি ও কর্মপন্থার যে বিরোধ তা বোধহয় দূর করা সম্ভব। কারণ, সবার লক্ষ্য অভিন্ন। আর লক্ষ্য অর্জনে সফলতার জন্য তা অপরিহার্য। যদি আমরা ইসলামের বুনিয়াদি উসূল ও মৌলনীতি সংরক্ষণ এবং নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার স্রোত মোকাবেলাকে সত্যিকার অর্থে মূল লক্ষ্য মনে করি তাহলে এটিই সেই ঐক্যের বিন্দু যেখানে এসে মুসলিমদের সব ফের্কা ও দল একত্র হয়ে কাজ করতে পারে। আর তখনই এই স্রোতের বিপরীতে কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে। কিন্তু বাস্তব দিকে তাকালে বলতে হয়, এই মূল লক্ষ্যটিই আমাদের দৃষ্টি থেকে গায়েব হয়ে গেছে। এ কারণে আমাদের সমস্ত সামর্থ্য এবং জ্ঞান ও গবেষণার সমুদয় শক্তি

নিজেদের ইখতিলাফি মাসআলায় ব্যয় হচ্ছে। ওগুলোই আমাদের ওয়াজ, জলসা, পত্রিকা ও বই-পুস্তকের আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এমন কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ এ কথা মনে করতে বাধ্য হচ্ছে যে, ইসলামধর্ম শুধু এই দুই-চার জিনিসের নাম। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইখতিলাফি মাসআলাসমূহে যে দিকটি কেউ অবলম্বন করেছে তার বিপরীতটিকে গোমরাহি এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা আখ্যা দিচ্ছে। ফলে আমাদের যে শক্তি কুফর, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং সমাজে বাড়তে থাকা বেহায়াপনার মোকাবেলায় ব্যয় হতে পারত তা এখন পারস্পরিক কলহ-বিবাদে ব্যয় হচ্ছে। ইসলাম ও ঈমান আমাদের যে ময়দানে লড়াই ও আত্মত্যাগের আহ্বান জানায় সেই ময়দান শত্রুর আক্রমণের জন্য খালি পড়ে আছে। আমাদের সমাজ অপরাধ ও অন্যায়ে ভরপুর, আমল-আখলাক বরবাদ, চুক্তি ও লেনদেনে ধোঁকাবাজি, সুদ, জুয়া, মদ, শূকর, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও অপরাধপ্রবণতা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিশে গেছে।

প্রশ্ন হলো, আম্বিয়া কেরামের বৈধ উত্তরসূরি এবং দেশ ও ধর্মের প্রহরীদের নিজেদের মধ্যকার মতপার্থ্যকের বেলায় যতটা সংক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় তার অর্ধেকও কেন সেসব খোদাদ্রোহিদের বেলায় দেখা যায় না? আমাদের বাকশক্তি এবং লেখনীশক্তি যেমন শৌর্যবীর্যের সাথে নিজেদের ইখতিলাফি মাসআলায় লড়াই করে তার সামন্যতম অংশও কেন ঈমানের মৌলিক বিষয়ের উপর আনা হুমকির মোকাবেলায় ব্যয় হয় না? মুসলিমদের মুরতাদ বানানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা সবাই কেন সিসাঢালা প্রাচীরের মতো রুখে দাঁড়াই না? সর্বোপরি আমরা এ বিষয়ে কেন চিন্তা করি না যে, নবী প্রেরণ ও কুরআন নাযিলের ওই মহান উদ্দেশ্য, যা পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এবং যা পরকে আপন বানিয়ে নিয়েছে, যা আদম সন্তানদের পশুত্ব থেকে মুক্ত করে মানবতার মর্যাদা দিয়েছে এবং যা সমগ্র দুনিয়াকে ইসলামের আশ্রয়কেন্দ্র বানিয়েছে তা কি শুধু এসব বিষয়ই ছিল, যার ভেতরে আমরা লিপ্ত এবং অন্যদের হেদায়েতের পথে আনার তরীকা ও পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত দেওয়ার কি এটাই ছিল ভাষা, যা আজ আমরা অবলম্বন করেছি?

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ 'এখনো কি সময় হয়নি যে সময়ে ঈমানদারদের অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণ ও তার নাযিলকৃত সত্যের সামনে অবনত হবে?'[১৭]

শেষ পর্যন্ত ওই সময় কবে আসবে যখন আমরা দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পদ্ধতিগত বিষয়াবলি থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে মৌলিক নীতিমালা সংরক্ষণ এবং অবক্ষয়প্রাপ্ত এবং সমাজের সংশোধনকে নিজেদের আসল কর্তব্য মনে করব? দেশের মধ্যে খ্রিস্টবাদ ও কমিউনিজমের সর্বগ্রাসী সয়লাবের খবর নেব? কাদিয়ানীদের হাদীস অস্বীকার ও ধর্ম-বিকৃতির জন্য কায়েম করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও ইসলাহের মাধ্যমে মোকাবেলা করব?

আর যদি আমরা এগুলো না করি এবং হাশরের ময়দানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ প্রশ্ন করেন যে, আমার দ্বীন ও শরীয়তের উপর এই হামলা হচ্ছিল, ইসলামের নামে কুফরি বিস্তার লাভ করছিল, আমার উম্মতকে আমার দুশমনের উম্মত বানানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছিল, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটছিল, আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য নাফরমানি করা হচ্ছিল তখন তোমরা ইলমের দাবিদাররা কোথায় ছিলে? তোমরা এর মোকাবেলায় কতটা মেহনত এবং ত্যাগ স্বীকার করেছ? কতজন বিপথগামী ব্যক্তিকে সঠিক পথে এনেছ? তো আমাদের ভেবে দেখা উচিত, সেদিন আমাদের উত্তর কী হবে?

কর্মপন্থা

এ জন্য জাতির প্রতি সংবেদনশীল এবং ঈমান ও ইসলামের উসূল ও মাকসাদসমূহের প্রতি সচেতন উলামায়ে কেরামের কাছে আমার ব্যথাভরা নিবেদন, মাকসাদের গুরুত্ব ও নাযুকতাকে সামনে রেখে সবার আগে মন থেকে এই অঙ্গীকার করুন যে, নিজেদের ইলমী ও আমলী যোগ্যতা এবং কথা ও কলমের শক্তিকে বেশির থেকে বেশি ওই ময়দানে নিয়োজিত করবেন, যার সংরক্ষণের জন্য কুরআন ও হাদীস আপনাদের ডাকছে।

---

১৭ সূরা হাদীদ (৫৭) : ১৬

১.সম্মানিত উলামা! এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন এবং প্রতিজ্ঞা করুন যে, এ কাজের জন্য নিজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে বেশির থেকে বেশি সময় বের করবেন।

২. পরস্পর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও ইজতিহাদি বিরোধকে কেবল নিজেদের দরস এবং লেখালেখি ও ফতোয়া পর্যন্ত সীমিত রাখবেন। আম-জলসা, পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি, পরস্পর বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে তাকে বড় করবেন না। নবীদের মতো দাওয়াত ও ইসলামের নীতির অধীনে কষ্টদায়ক ভাষা, নিন্দা, উপহাস, আক্রমণ ও সাংবাদিকদের মতো বাক্যচালনা থেকে বিরত থাকবেন।

৩. সমাজে ছড়িয়ে পড়া ব্যাধিসমূহের প্রতিকারের জন্য হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে স্নেহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা ও আঙ্গিকে কাজ শুরু করুন।

নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা এবং কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতির মোকাবেলার জন্য পয়গম্বরদের দাওয়াতের নীতি অনুসারে প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল, আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা এবং হৃদয়গ্রাহী দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এর সঙ্গে নিজের মুখের ভাষা ও কলমের শক্তিকে ওয়াকফ করে দিন।

খুবই আফসোস হচ্ছে যে, যা কিছু বললাম আসলে সেসব বলার যোগ্য আমি নই। আলেমদের সামনে এমন দুঃসাহস দেখানোও আমার জন্য সাজে না। কিন্তু ব্যথিত অন্তরের কিছু কথা মুখে চলে এসেছে। মুহতারাম মুরুব্বিরা আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বক্তব্যে যদি ভালো কিছু থাকে তবে তাদের দায়িত্ব হলো সেটা গ্রহণ করে নেওয়া। আমি আশা করি যদি উলামায়ে কেরাম এদিকে একটু মনোযোগী হোন এবং কাজ শুরু করেন তবে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ان تنصرالله ينصركم 'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন' এর বাস্তবায়ন স্বচক্ষে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب